পুস্তক পর্যালোচনা ঃ বাঙালী জীবনে রমণী

(লেখক ঃ নীরদ চন্দ্র চৌধুরী)

অলকা রাণী রায় *

ভূমিকা

'বাঙালী জীবনে রমণী' নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ। ১৯৬৮ সালে কলিকাতা হতে বইটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। বাংলাদেশে ২৬শে মার্চ, ১৯৯০ সালে পল্লব পাবলিশার্সের পক্ষে মোঃ গোলাম আলি কর্তৃক ৩১, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫ থেকে বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সংস্করণে বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আশু বন্দোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশ সংস্করণে প্রচ্ছদ এঁকেছেন সমর মজুমদার। দুটি ভিন্ন সংস্করণই বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদের চিত্রে রয়েছে ভিন্নতা, ভারতীয় সংস্করণে প্রচ্ছদে রয়েছে কালো মলাটের উপর গেলাপী রং এর একটি বৃত্ত এবং বাংলাদেশ সংস্করণে রয়েছে একটি নারী মূর্তি। তার হাতে একটি ফুল এবং একটি প্যাঁচানো রশির চিত্র। প্রচ্ছদের তাৎপর্যে নারী অবহেলিতা, সংস্কারে বন্দিনী এবং প্রতিবন্ধকতার আবর্তে নিমজ্জিত। চিত্রে এটি প্রকট হয়েছে।

বইটিতে ৬টি পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং এক একটি পরিচ্ছেদের এক একটি নামকরণ করা হয়েছে। যথ ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ- কাম ও প্রেম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-দেশাচার, তৃতীয় পরিচ্ছেদ-বাংলার দৃশ্য ও বাঙালীর ভালবাসা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ-বাঙালী সমাজ ও নতুন ভালবাসা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ-বাঙালীর মন ও ভালবাসা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-মন্ত্রদ্রষ্টা বঙ্কিম। এছাড়া রয়েছে লেখকের পাঠক পাঠিকাদের প্রতি নিবেদন, ভূমিকা-যার শিরোনাম লেখক দিয়েছেন বিষয়টা কি? উপসংহার এবং সূচি। বইটি একটি প্রবন্ধ সাহিত্যের আকারে লিখিত। চিরায়ত বাংলার জীবন যাত্রায় নারীর অবস্থান, প্রাচীন ও সমকালীন সাহিত্যে নারীর প্রকাশ ও সামাজিক জীবনে নারীর ভূমিকা ও তার অধিকারের পরিমাপ করার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক বইটিতে। তীর্যক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে নারীকে। পুরুষতান্ত্রিক বাঙালী সমাজে কতটুকু মর্যাদায় নারী আসীন, তার তুলমূল্য বিচার লেখক করতে চেয়েছেন। পুরুষ যে মানদন্ডে মূল্যায়িত হয়, নারীর

---

* ঊনবিংশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রশিক্ষণার্থী (ক্রমিক নং গ-৩১৬), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

ক্ষেত্রে সে একই মানদন্ড যে ব্যবহৃত হয় না এটাকে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে এখানে। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের রৌদ্র করোজ্জ্বল প্রহরে নারী কি মানবী না কোন বস্তু সে প্রশ্নটাই লেখক এখানে পাঠক পাঠিকাদের প্রতি ছুড়ে দিয়েছেন।

বইটি প্রকাশের পর আজ দীর্ঘদিন গত হলেও এখনও নারী অবস্থানের খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্যক্তি হিসেবে নর-নারীর মধ্যে যে নিবিড় ও বিশিষ্ট মানসিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় সে পরিধির মধ্যেই বইটির লেখা সীমাবদ্ধ। বইটির প্রধান বিষয় স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক চির রহস্যময়। প্রেম বা ভালবাসা বোঝাবার বা বুঝবার কোন জিনিষ নয়,উপলব্ধির বিষয়, বইটিতে লেখক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী এ কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

লেখক পরিচিতি

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন পূর্ববাংলার, অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা উপেন্দ্রনারায়ন, মা সুশীলা সুন্দরী। তের বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন জন্মভূমিতে, এরপর চলে যান কলিকাতায়। বি, এ পরীক্ষায় ইতিহাসে অনার্সে প্রথম শ্রেনীতে প্রথম, এম, এ পরীক্ষায় দুটি পেপার দিয়ে আর দেননি। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার এখানেই অবসান। পরীক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর, জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল আশৈশব ও অতি প্রবল। একটানা বেশীদিন চাকরি করেননি কোথাও। ১৯২৮ সালে মডার্ন রিভিউতে সহকারী সম্পাদকের চাকরি। ১৯৩২ এ বিবাহ। স্ত্রী অমিয়া চৌধুরানী। বিয়ের পর মডার্ন রিভিউর চাকরি ছাড়েন। তিরিশের দশকের শেষে শরৎচন্দ্র বসুর সচিব নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতা রেডিওতে যুদ্ধের ঘটনাবলীর ভাষ্যকার ছিলেন। পরে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে "অল ইন্ডিয়া রেডিও"তে চাকরি পেয়ে দিল্লী চলে যান। সেখান থেকেই অবসর। ১৯৭০ সাল থেকে বিলেতে আছেন। এখন ব্রিটিশ নাগরিক। ১৯৫১ সালে প্রথম বই- "The Autobiography of An Unknown Indian",১৯৫৯ সালে- "A Passage to England" ১৯৬৫ সালে- "The Continent of Circe". ১৯৬৭ সালে- "The Intelectual in India". ১৯৭০ সালে- "To live or Not to live", ১৯৭৪ সালে "Scholar Extraordinary" (ম্যাক্সমুলার জীবনী), ১৯৭৫ সালে "Clove of India." ১৯৭৬ সালে "Culture in the Vanity Bag". ১৯৭৯ সালে"Hinduism "১৯৮৭ সালে- "The hand, Great Anarch" (আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত), ১৯৮৮ সালে দ্বিতীয় বাংলা বই- "আত্মঘাতী বাঙালী" (১ম খন্ড) ও ১৯৯২ সালে ২য় খন্ড, ১৯৯৪ সালে-"আমার দেবোত্তর সম্পত্তি" এবং ১৯৯৬ সালে "আত্মঘাতী বাঙালী" ৩য় খন্ড প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ সালে পেয়েছেন অক্সফোর্ডের সম্মানীত ডি, লিট ডিগ্রী। ১৯৯৩ সালে ইংল্যান্ডের রাণী তাঁকে C. B. E. উপাধি প্রদান করেন।

মূল বিষয়বস্তু

বইটির মূল বিষয়বস্তু ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে লিখিত হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবন্ধ। এখানে পরিচ্ছেদ-ওয়ারী প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হল ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ কাম ও প্রেম

প্রেম ও কামনার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অবস্থান সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। প্রেমের প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ধৃতি সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতচন্দ্র, জয়দেব, কালিদাস সহ অনেক প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ধৃতি লেখক ব্যবহার করেছেন প্রেমের ধারণা প্রকাশের নিমিত্তে। ইংরেজ কবি সাক্‌লিং এবং ডি, এইচ, লরেন্স এর ইংরেজি কোটেশানও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রেম শুধুমাত্র মনোজাগতিক, অবস্তুগত, আবেগায়ত বিষয় নয় এর সঙ্গে জাগতিক সম্পর্কও বিদ্যমান থাকে। আবার কাম শুধুমাত্র জৈবিক তাড়না বা ইন্দ্রিয় সুখ প্রক্রিয়া নয় এর সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতিসহ সমমানসিকতার সমন্বয় থাকতে হয়, আবেগ থাকতে হয়, পারস্পরিক আকর্ষণবোধ থাকতে হয়; নতুবা কাম শুধুমাত্র যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়। কামের অশ্লীল বহি:প্রকাশ হল লুচ্চামি যা প্রাচীন বাঙালী সমাজে বিস্তার লাভ করেছিল বর্তমানেও এর খুব একটা ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রেম যতটা বাঙালী সমাজে প্রকাশিত, তার চেয়ে বেশীমাত্রায় প্রকটিত হয়েছে কামনা। তথাপি প্রেমকে বাদ দিয়ে কাম নেই। বিশুদ্ধতম, পবিত্রতম প্রেমেও কাম আছে। কামবর্জ্জিত প্রেম নেই। প্রেমের চরম আত্মসমর্পণ ঘটে কামনা তৃপ্তির মাধ্যমেই। প্রেম ও কাম নর-নারী জীবনে অবিচ্ছেদ্য ও পরিপূরক দু'টি আবশ্যকীয় ধারা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দেশাচার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে উনবিংশ শতাব্দির প্রথমে বাংলার বাঙালী সমাজে শুরু হয় অবাধ যৌনতা, কামের বিকৃত রূপ। এর সাথে প্রেমের কোন সংশ্রব ছিল না, ছিল না কোন আদর্শ। এক ইতরীকৃত লালসা মিটানোর প্রবৃত্তিতে তৎকালীন বাঙালী সমাজ মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। এখানে প্রেমের কোন স্থান ছিল না। তৎকালীন বাঙালী ধনিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ব্যবসায়ী শ্রেণী স্ত্রীর সংগে রাত কাটানোকে অমর্যাদাকর মনে করত। নিজেদের অভিজাত্য প্রদর্শনে জন্য রাখত রক্ষিতা, রাত কাটাত বারবণিতার ঘরে। স্ত্রীর থেকে রক্ষিতা বা বারবণিতার ছিল বেশী সামাজিক মর্যাদা। এ অবক্ষয় যুগের অবস্থা এ প্রবন্ধে লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এ সময়ে সমাজে পত্নী উপেক্ষিতা, অন্তপুরবাসীনী, স্বামী সঙ্গসুখ বঞ্চিতা এমনকি স্বামী দর্শনলাভে হতেন ব্যর্থ। গণিকারাই ছিল তৎকালীন পুরুষের একমাত্র আকর্ষণ, এমনকি স্ত্রীর অলংকার বিক্রি করেও গণিকাগমন ছিল নিত্যকার ঘটনা।

প্রবন্ধটিতেও লেখক ব্যবহার করেছেন সে সময়কার বিভিন্ন বাঙালী লেখক ও কবিদের উক্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বাংলার দৃশ্য ও বাঙালীর ভালবাসা

এ প্রবন্ধটিতে লেখক বাঙালীদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রীতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। এটাকে লেখক ভালবাসার এক নতুন রূপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেক বাঙালী কখনই সচেতন হয় নাই বরং রয়েছেন নিস্পৃহ। বাংলার জল, বায়ু, আকাশ, নদী এই শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র যা লেখকের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে, তা সম্পর্কে বাঙালী কত উদাসীন তা লেখক এখানে বুঝাতে চেয়েছেন। এখানে তিনি নিজেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে এখনও গ্রাম্য লেখক বালক হিসেবে ভাবতে ভালবাসেন বলে প্রকাশ করেছেন। বাঙলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বোঝাতে তিনি জ্ঞানদাস, ভারতচন্দ্রের 'বরষার বর্ণনা' ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেও এখানে বিভিন্ন উক্তি তিনি ব্যবহার করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী কত মোহনীয় তা লেখক এখানে বোঝাতে চেয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ বাঙালী সমাজ ও নতুন ভালবাসা

এ পরিচ্ছেদে বাঙালী সমাজে একটা রুচিশীল পরিবর্তনের দিক বর্ণনা করা হয়েছে। বাঙালীর জীবনে একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ অন্যদিকে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও অভ্যুদয় ঘটে। কামে নিয়োজিত রিপু নির্বাপিত হয়ে সূক্ষ্ম মার্জিত প্রেমানুভূতি পারিবারিক জীবনে বিকাশ লাভ করে। পত্নীগণ তাদের মর্যাদা পেতে শুরু করেন, গণিকাবৃত্তি সংকুচিত হয়ে আসে। এ সময় দু'ধরনের সমাজব্যবস্থা দেখা যায়। শহুরে ও গ্রামীণ। পল্লী পরিবেশে প্রেম ভালবাসার প্রকাশ পায় সারল্য, শহুরে প্রেমে প্রকাশ পায় পাশ্চাত্য রীতি। বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে রোমান্টিক প্রেমের, সমাজে শৃঙ্খলা বোধ প্রবাহিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বাঙালীর মন ও ভালাবাসা

এক সময় বাঙালী জীবন কাম পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন ছিল, তা দূরীভূত হয়ে শুরু হয় প্রেমের প্লাবণ। নারী শুধু ভোগ্যসামগ্রী নয় প্রেমের দেবীও বটে, এ কথাটি বাঙালীরা ভাবতে শুরু করেন। এ প্রবন্ধে লেখক এ কথাটি বর্ণনা করেছেন। ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জীবন হতে প্রেমের নতুন রূপের সন্ধান লাভ করার পর উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে বাঙালী এর আকর্ষণে হয়েছিল বিভোর। বাঙালী মেয়েদের মনেও প্রেমের বিকাশ লাভ করে পূর্ণভাবে যা এতদিন ছিল প্রচ্ছন্ন অবস্থায়। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও এ সময়কার প্রেমের ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। লেখক রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতি এখানে ব্যবহার করেছেন।

স্বাতন্ত্র এখানে বিদ্যমান রয়েছে। মুদ্রণগত সামান্য ত্রুটিই এখানে ধরা পড়ে। বাক্যবাণ ও ভাষাগত ব্যত্যয় ঘটেনি কোথাও। সমস্ত বইটিই সাধু ভাষায় লিখিত, ফলে অনেক জায়গায় লেখক জটিল বাক্য ব্যবহার করেছেন। বইটিতে কোন ছন্দপতন দেখা যায় না। সার্বিক বিচারে কাঠামোগত ত্রুটি বইটিতে নেই।

সার্বিক আলোচনা

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে ধ্রুপদী কোন লেখক নন। তিনি উপন্যাসিক নন, কবি নন, গল্পকার নন, সমালোচকও নন, তথাপিও তিনি লেখক। তীর্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ক্ষুরধার লেখনী শক্তির অধিকারী সমাজবিক্ষণী লেখক। তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য তীক্ষ্ণভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। তিনি নিজেকেও সমালোচনা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর তেমনি একটি সমাজবীক্ষণধর্মী রচনা। এ রচনায় তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি, বাঙালী সমাজ পরিবর্তনের রীতি, নারীদের অবস্থান প্রভৃতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বইটিতে অত্যন্ত অকপটে লেখক নারী সম্পর্কে বাঙালী পুরুষ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করেছেন। লেখককে একদিকে নৃতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবেত্তা বলে মনে হয়েছে। পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে নারী বঞ্চনার দৃশ্য দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রেম জীবনে সৌন্দর্য আনে। নারী ও বাংলার প্রকৃতি যে প্রেমের চিরায়ত উৎস, তা লেখক বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। কাম বিচ্ছিন্ন কোন প্রেম থাকতে পারে না, কামেই প্রেমের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটে, এসত্যটি লেখক সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। বইটিতে প্রবন্ধগুলি সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন লেখক ও কবির উক্তি তিনি বিষয়ের প্রয়োজনে যথাস্থানে ব্যবহার করেছেন। শব্দচয়ন ও বাক্যগঠন রীতি ব্যতিক্রমী ও আকর্ষক।

বইটিতে লেখক উদ্ধৃতি ব্যবহারে বিশেষ পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট হয়েছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজ পরিবর্তনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে পথিকৃৎ হিসেবে হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে লেখক কিছুটা একপেশে চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তৎসময়কার সমাজ পরিবর্তন আন্দোলনের পুরোধা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা রামহোন রায়, কালী প্রসন্ন সিংহ এদেরকে লেখক এড়িয়ে গেছেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের সমাজের ক্লেদাক্ত পরিবেশ পরিবর্তনের উৎস বর্ণনা করে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কিছুটা হেয় করেছেন। বইটিতে তিনি হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান বর্ণনা করেছেন কিন্তু বাঙালী সমাজে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর অবস্থান কি তা বর্ণনা করেননি। বাঙালী সমাজ বলতে তিনি উচ্চবিত্ত, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বুঝিয়েছেন, অন্য বর্ণের বা সাধারণ মানুষ তাঁর আলোচনায় আসেনি। কিছু অশ্লীল ও আঞ্চলিক শব্দ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে যা লেখক ইচ্ছে করলে পরিহার করতে পারতেন। শৃঙ্গাররস ও আদিরসাত্মক উদ্ধৃতি ব্যবহার অনেক সময় অশ্লীল মনে হয়েছে। তবে লেখক

বিষয়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন বলে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। বইটিতে লেখক কোন অসত্য ভাষণ প্রদান করেন নাই। পাঠককে তিনি বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পরিবেশের সাথে সহজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

উপসংহার

বইটি একটি ব্যতিক্রমী সাহিত্য সৃষ্টি নিঃসন্দেহে। পঠনে কখনও একঘেয়েমী বোধ জাগ্রত হয় না। নারীদের প্রতি মূল্যায়নের নতুন ভাবনা এনে দেয় যে কাম ও প্রেম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ সত্যটি পাঠকের কাছে প্রকট হয়ে উঠে, এখানেই লেখকের সাফল্য। বাঙালী সমাজ বলতে তিনি শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দু দ্বারা গঠিত সমাজ বোঝাতে চেয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশ্চাত্য ও ইংরেজির প্রতি আসক্তি এটাও লেখকের ব্যর্থতা। তাঁর মত সব্যসাচী লেখকের কাছে এ ধরনের মামুলী পক্ষপাত আশা করা যায় না। বইটি সাহিত্যের বিচারে উন্নত গুণগত মানের অধিকারী। যদিও সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব এখানে বিধৃত হয়নি, তথাপি প্রবন্ধগুলি গীতিধর্মী ও নান্দনিক। বইটিতে লেখক প্রেমবর্জিত জীবন ক্লেদাক্ত, প্রেমপূর্ণ জীবন সৌন্দর্যমন্ডিত, নারী এই প্রেম ও সৌন্দর্যের পাত্রী, এ কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন এবং তিনি এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সফলতার দাবীদার। প্রবন্ধ সাহিত্য মানুষকে/পাঠককে এমন আকর্ষণ করতে পারে "বাঙালী জীবনে রমণী" বইটি তার জলন্ত উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের গ্রন্থ দ্বিতীয়টি নেই। তবে কালীপ্রসন্নের "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" (যা আধুনিক কালের নয়), হুমায়ুন আজাদের 'নারী'(বইটি ধারণা থেকে অনেক দূরে) তুলনামূলক আলোচনায় 'বাঙালী জীবনে রমণী'র সমকক্ষ নয়। বইটি একটি ব্যতিক্রমী সাহিত্য প্রয়াস। পাঠক সমাজে বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।